DEPT –POLITICAL SCIENCE

POL-H-CC-T-3(SEM-2ND)

UNIT-4

ELECTION COMMISSION

২৭.৭ নির্বাচন কমিশন (Election Commission)

নির্বাচন কমিশনের গুরুত্ব ।। পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু (H. N. Kunzru)-র মতানুসারে নির্বাচন ব্যবস্থা নিপুণ না হলে গণতন্ত্র উৎসেই জরাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ভিত্তিকে শক্তিশালী করার জন্য নির্বাচন ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও অবাধ হওয়া আবশ্যক। তার জন্য নির্বাচন পরিচালনার নিরপেক্ষ ব্যবস্থা থাকা দরকার। ভারতের প্রতিনিধিমূলক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাফল্য সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যবস্থার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। এই কারণে ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতাগণ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব শাসন বা আইন-বিভাগের উপর ন্যস্ত না করে একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সংস্থার উপর অর্পণ করেছেন। সংবিধানে এই সংস্থা সম্পর্কিত নিয়মকানুন বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। নির্বাচনে দুর্নীতি ও পক্ষপাতিত্ব রোধ করার জন্য এই ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। ভারতীয় সংবিধান এক্ষেত্রে কানাডার শাসনতন্ত্রকে অনুসরণ করেছে।

নির্বাচন কমিশন হল একটি স্থায়ী ও স্বাধীন সংস্থা। সুষ্ঠু ও স্বাধীন নির্বাচন সুনিশ্চিত করার জন্য সংবিধানে উপযুক্ত নির্বাচন কমিশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সংবিধান অনুসারে অনুষ্ঠিত পার্লামেন্টের ও রাজ্য আইনসভাসমূহের সকল নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকাসমূহের প্রস্তুতি সম্পর্কে অধীক্ষণ, নির্দেশন ও নিয়ন্ত্রণ এবং সংশ্লিষ্ট নির্বাচনসমূহের এবং রাষ্ট্রপতি পদের ও উপ-রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচনের পরিচালনা একটি কমিশনের উপর ন্যস্ত হবে [৩২৪ (১) ধারা]। সুতরাং নির্বাচন কমিশন হল একটি সর্বভারতীয় সংস্থা। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারসমূহের ক্ষেত্রে এই নির্বাচন কমিশন প্রাসঙ্গিক। কিন্তু অঙ্গরাজ্যের পঞ্চায়েত বা পৌরসভাসমূহের নির্বাচনের দায়িত্ব এই নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত নেই। পঞ্চায়েত ও পৌরসভার নির্বাচন পরিচালনার জন্য ১৯৯২ সালে ৭৩তম এবং ৭৪তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে স্বতন্ত্র রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের গঠন // নির্বাচন কমিশন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (Chief Election Commissioner)-কে নিয়ে অথবা মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং কয়েকজন অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়ে গঠিত হয় [৩২৪(২) ধারা]। অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারের সংখ্যা সম্পর্কে সংবিধানে কিছু বলা হয় নি। অন্যান্য কমিশনারের প্রয়োজনীয়তা ও সংখ্যা রাষ্ট্রপতি নির্ধারণ করেন। রাষ্ট্রপতি সংবিধান অনুসারে বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনমত অন্যান্য কমিশনারদের সংখ্যা নির্ধারণ করে থাকেন। নির্বাচন কমিশনের সদস্যসংখ্যা যদি একাধিক হয়, তাহলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারই কমিশনের সভাপতি (Chairman) হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন [৩২৪(৩) ধারা]। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য কমিশনারকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন। তবে রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত আইন অনুসারে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নির্বাচন কমিশনের প্রধান ও সভাপতি (৩২৪ ধারা)।১৯৫০ সালে সংবিধান চালু হওয়ার সময় থেকে ১৯৮৯ সালের ১৫ অক্টোবর অবধি কেবলমাত্র মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত ছিল।

বহু সদস্য নির্বাচন কমিশন সম্পর্কিত অর্ডিন্যান্স // মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হিসাবে টি. এন. শেষণ নির্বাচন বাতিল, নির্বাচন স্থগিত সম্পর্কিত কিছু বিতর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সমস্ত সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে ভারতীয় রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পক্ষসমূহের মধ্যে প্রতিবাদী বক্তব্য ব্যক্ত হয়। শেষণের কিছু সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টে মামলা-মোকদ্দমাও হয়। নির্বাচন কমিশনের একক প্রধান হিসাবে শেষণের স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তকে রদ করার জন্য এবং ভারতীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎকে নিরাপদ করার উদ্দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও কর্তৃপক্ষ নির্বাচন কমিশনকে বহু সদস্য বিশিষ্ট করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। অবশেষে ১৯৯৩ সালের ১লা অক্টোবর রাষ্ট্রপতি শঙ্কর দয়াল শর্মা কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত অনুসারে এক অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে বহু সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করেন। সংশ্লিষ্ট অর্ডিন্যান্স অনুসারে শেষণ ছাড়া কেন্দ্রীয় কৃষি সচিব এম. এস. গিল এবং আইন কমিশনের প্রাক্তন সদস্য-সচিব টি. এস. কৃষ্ণমূর্তিকে অন্য দুই সদস্য করা হয়। ১৯৯৩ সালের ১৬ই ডিসেম্বর নির্বাচন কমিশনকে বহু সদস্য বিশিষ্ট করা সম্পর্কে একটি বিল ধ্বনি ভোটে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শেষণ নির্বাচন কমিশনকে বহু সদস্য বিশিষ্ট করার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন নি। শেষণের প্রতিবাদী কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি সুপ্রীম কোর্টের কাছে আসে। ১৯৯৫ সালের ১৪ই জুলাই সুপ্রীম কোর্টের পাঁচজন সদস্যবিশিষ্ট সংবিধান বেঞ্চ সর্বসম্মতভাবে এ বিষয়ে একটি রায় দেন। এই রায়ে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারি করা বিজ্ঞপ্তি বহাল রাখা হয়। সুতরাং ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও পদমর্যাদার দিক থেকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হলেন অন্য দুই নির্বাচন কমিশনারের সমান। বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার পরিপ্রেক্ষিতেও মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং অন্য দুজন নির্বাচন কমিশনার সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারপতির সমান বেতন, ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে অন্য দু'জন নির্বাচন কমিশনারের কোন বিষয়ে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হলে, কমিশন সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

শেষণ এই রায় পুনর্বিবেচনার জন্য সুপ্রীম কোর্টে একটি রিভিউ পিটিশন করেন। ১৯৯৫ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর বিচারপতি এ. আর আহমেদির নেতৃত্বাধীন সুপ্রীম কোর্টের পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট সংবিধান বেঞ্চ শেষণ-এর রিভিউ পিটিশন প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁরা জানিয়ে দেন যে গুরুত্বের প্রশ্নে শেষণ-গিল-কৃষ্ণমূর্তি সমমর্যাদা সম্পন্ন।

নির্বাচন কমিশনের অন্যান্য পদাধিকারী // ডেপুটি নির্বাচন কমিশনাররা নির্বাচন কমিশনের কাজে সাহায্য করেন। জনপালন কৃত্যক থেকে তাঁদের নেওয়া হয়। নির্বাচন কমিশন নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য তাঁদের নিযুক্ত করে। ডেপুটি কমিশনারদের নিচে আছেন সচিবরা, যুগ্মসচিবরা, উপসচিবরা এবং অবর সচিবরা। নির্বাচন কমিশনের সচিবালয়ে এঁরা কাজ করেন।

আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশনার ∫∫ প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচন ও উপনির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য করার জন্য রাষ্ট্রপতি যতগুলি প্রয়োজন আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশনার (Regional Election Commissioner) নিযুক্ত করতে পারেন। তবে এ ধরনের নিয়োগের আগে রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ করতে হয় [৩২৪(৪) ধারা]। আঞ্চলিক কমিশনারগণ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করেন। আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশনারগণ সাধারণতঃ রাজ্য-বিধানসভা ও রাজ্য-বিধানপরিষদের নির্বাচন এবং রাজ্য থেকে লোকসভা সদস্য নির্বাচনের ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য করে থাকেন। ১৯৮৪ সালে অষ্টম লোকসভার সদস্য নির্বাচনের প্রাক্কালে পূর্বাঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চল, উত্তরাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল, উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চল—এই ছ'টি অঞ্চলের জন্য ছ'জন আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করা হয়। এঁদের নিয়োগ করা হয় নির্বাচনের ৩ মাস আগে। নির্বাচনের পর ৩ মাস পর্যন্ত এঁরা ক্ষমতাসীন থাকেন। অর্থাৎ এঁদের কার্যকালের মেয়াদ হল ৬ মাস।

রাজ্যস্তরে নির্বাচন কমিশন ∫∫ বর্তমানে প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যে একজন মুখ্য নির্বাচনী অফিসার (Chief Electoral Officer) থাকেন। আবার ১৯৬৬ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনে প্রত্যেক জেলার জন্য একজন জেলা নির্বাচনী অফিসার (District Election Officer) নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শক্রমে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসারকে নিযুক্ত করেন। মুখ্য নির্বাচনী অফিসারের নিচে থাকেন জেলা রিটার্নিং অফিসার। জেলার কালেক্টরই এই ভূমিকা পালন করেন। তিনি নিযুক্ত করেন জেলার প্রত্যেক নির্বাচনী ক্ষেত্রের জন্য একজন করে রিটার্নিং অফিসার এবং প্রতিটি ভোটদান কেন্দ্রের জন্য প্রিসাইডিং অফিসার।

কার্যকাল ও পদচ্যুতি ∫∫ নির্বাচন কমিশনের সদস্যদের এবং আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশনারদের চাকরির শর্তাদি ও কার্যকাল রাষ্ট্রপতি স্থির করেন। তবে এক্ষেত্রেও পার্লামেন্ট প্রণীত আইন অনুসারে রাষ্ট্রপতি ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের চাকরির শর্তাদি, কার্যকাল প্রভৃতি পার্লামেন্ট-প্রণীত আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। এখন ছ'বছরের জন্য মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে নিযুক্ত করা হয়। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার, অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার ও আঞ্চলিক কমিশনারদের অপসারণের পদ্ধতির ব্যাপারে সংবিধানে উল্লেখ আছে। কেবলমাত্র সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের অপসারণের পদ্ধতিতেই মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে তাঁর পদ থেকে অপসারিত করা যায় [৩২৪(৫) ধারা]। প্রমাণিত অসামর্থ্য ও অসদাচরণের অভিযোগক্রমে রাষ্ট্রপতি তাঁকে পদচ্যুত করতে পারেন। তবে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে যদি মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহলে সেই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই কেবল রাষ্ট্রপতি তাঁকে পদচ্যুত করতে পারেন [৩২৪(৫) ধারা]। অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার ও আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশনারদেরও রাষ্ট্রপতি পদচ্যুত করতে পারেন। তবে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সুপারিশের ভিত্তিতেই তিনি তা করতে পারেন। অর্থাৎ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার যদি সুপারিশ না করেন, তা হলে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার বা আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশনারদের পদচ্যুত করতে পারেন না [৩২৪(৫) ধারা]।

ক্ষমতা ও কার্যাবলী (Powers and Functions) ∫∫ সংবিধানে নির্বাচন কমিশনের কার্যাবলী বিশদভাবে বলা হয় নি। তবে মুখ্য দায়িত্ব সম্পর্কে উল্লেখ আছে। তা ছাড়া, কমিশনের কয়েকটি দায়িত্ব ও ক্ষমতার উল্লেখ ভারতের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনেও পাওয়া যায়। নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলী প্রকৃতিগত বিচারে ত্রিবিধ : (ক) প্রশাসনিক (খ) পরামর্শপ্রদানমূলক এবং (গ) আধ-বিচার বিভাগীয়। ভারতের নির্বাচন কমিশনকে নিম্নলিখিত দায়িত্বসমূহ সম্পাদন করতে হয়।

(১) পার্লামেন্ট, রাজ্য আইনসভা ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক সংস্থাসমূহের নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশন আইনানুসারে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করে এবং প্রয়োজন মত সংশোধন করে। বস্তুত ভোটার-তালিকা প্রণয়ন, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ও ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত আছে [৩২৪(১) ধারা]।

(২) নির্বাচন কমিশন সমগ্র দেশব্যাপী নির্বাচনী ক্ষেত্রসমূহের ভৌগোলিক এলাকা নির্ধারণ করে। পার্লামেন্টের 'সীমানির্দেশকরণ কমিশন আইন' (Delimitation Commission Act) অনুসারে নির্বাচন কমিশন এই দায়িত্ব পালন করে। পার্লামেন্ট ১৯৫২, ১৯৬২, ১৯৭২ এবং ২০০২ সালে সীমানির্দেশকরণ আইন প্রণয়ন করেছে।

(৩) সংবিধান ও দেশের সাধারণ আইন অনুসারে নির্বাচন কমিশন পার্লামেন্ট, রাজ্য বিধানসভা এবং রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ তদারকি ও পরিচালনা করে।

(৪) নির্বাচনের তারিখ ও সম্পূর্ণ নির্ঘন্ট প্রকাশ করা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব। কমিশন যে-কোন নির্বাচনের আগে নির্বাচনের তারিখ, মনোনয়নপত্র পেশ করার তারিখ ও প্রত্যাহার করার তারিখ, মনোনয়নপত্রের বৈধতা বিচারের তারিখ প্রভৃতি নির্ধারণ করে।

(৫) নির্বাচন কমিশন তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সম্পাদনে সাহায্য করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারীর ব্যবস্থা করার জন্য রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যের রাজ্যপালদের অনুরোধ করতে পারে। সংবিধানের ৩২৪(৬) ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের এই অনুরোধ রক্ষা করতে হয়।

(৬) নির্বাচন কমিশন নির্বাচন সম্পর্কিত যে-কোন বিরোধ নিয়ে তদন্ত করার জন্য তদন্ত কমিশন গঠন করতে পারে।

(৭) **নির্বাচনী প্রতীক প্রদান** // নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনী প্রতীক প্রদান করে। অনেক সময় কোন রাজনৈতিক দলে ভাঙ্গন দেখা দেয়। তখন সেই দলের নির্বাচনী-প্রতীকের দাবি নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয়। এ রকম ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই হল চূড়ান্ত। স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এ রকম ঘটনার নজির আছে। কংগ্রেস দল কংগ্রেস(ই) ও কংগ্রেস(স) দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। নির্বাচন কমিশন মূল কংগ্রেস দল হিসাবে কংগ্রেস (ই)-কেই স্বীকৃতি জানায়। তেমনি আবার লোকদল বহুগুণা-গোষ্ঠী এবং অজিত-গোষ্ঠী—এই দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। লোকদলের নির্বাচনী প্রতীক লোকদল (বহুগুণা)-কেই নির্বাচন কমিশন প্রদান করে।

(৮) **নির্বাচন স্থগিত বা বাতিল** // নির্বাচন কমিশন নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে যে-কোন নির্বাচন কেন্দ্রের নির্বাচন স্থগিত রাখতে বা বাতিল করতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ব্যাপক কারচুপি ও দুর্নীতির অভিযোগের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন ১৯৮১ সালের জুন মাসে উত্তরপ্রদেশের গাড়োয়াল লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন বাতিল করে দেয়। তারপর রাজ্যসরকার প্রয়োজনীয় পুলিশী সাহায্যের ব্যবস্থা করতে অস্বীকার করায় আবার নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়। কমিশন সুস্পষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে যে-কোন কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে পারে। নির্বাচন কমিশন কোন নির্বাচন কেন্দ্রের ভোট গণনা পুরোপুরি বা আংশিকভাবে বন্ধ রাখতে পারেন। আবার কোন কেন্দ্রের ফলাফল ঘোষণা কমিশন স্থগিত রাখতে পারে।

(৯) **আইনসভার সদস্যদের অযোগ্যতার প্রশ্নে ভূমিকা** // পার্লামেন্ট ও রাজ্য আইনসভার সদস্যের অযোগ্যতা সম্পর্কে নির্বাচন কমিশন যথাক্রমে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালকে পরামর্শ দেয়। সংসদের কোন কক্ষের কোন সদস্যের অযোগ্যতার ব্যাপারে কোন প্রশ্ন দেখা দিলে তা রাষ্ট্রপতির বিচার-বিবেচনার জন্য পেশ করতে হয়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তই হল চূড়ান্ত। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে রাষ্ট্রপতি বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ করেন। কমিশনের পরামর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন (১০৩ ধারা)। তেমনি রাজ্য আইনসভার কোন সদস্যের অযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠলে তা রাজ্যপালের বিচার-বিবেচনার জন্য পেশ করতে হয়। রাজ্যপালও এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ করেন এবং তদনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন (১৯২ ধারা)। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা দরকার যে ৪২তম সংশোধনী আইন (১৯৭৬)-এর মাধ্যমে বলা হয়েছিল যে রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ করবেন, কিন্তু সেই পরামর্শ মানতে তাঁরা বাধ্য নন। তবে সংবিধানের ৪৪তম সংশোধনে (১৯৭৮)-র মাধ্যমে এই পরিবর্তনটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। যাইহোক বর্তমানে নির্বাচন সম্পর্কিত বিরোধ মীমাংসার দায়িত্ব আদালতের হাতে ন্যস্ত আছে। [সংবিধানে ১৯তম সংশোধন (১৯৬৬)]।

(১০) নির্বাচনী প্রচারের সময় বেতার ও দূরদর্শনে রাজনীতিক দলসমূহের প্রচারের পর্যায়-তালিকা তৈরি করে।

(১১) রাষ্ট্রপতির শাসনাধীন কোন অঙ্গরাজ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব কি না সে বিষয়ে কমিশন রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেয়। কমিশনের এই পরামর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি সেই অঙ্গরাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসনের মেয়াদ এক বছরের পরে বাড়াতে পারেন।

(১২) নির্বাচনের জন্য কমিশন রাজনীতিক দলসমূহকে রেজিস্ট্রিকরণ করে এবং রেজিস্ট্রিকৃত দলগুলিকে জাতীয় বা রাজ্য দলের মর্যাদা দেয়। নির্বাচনী সাফল্যের ভিত্তিতে এই মর্যাদা প্রদান করা হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, কোন রাজনীতিক দলকে নিম্নোক্ত ভিত্তিতে জাতীয় দলের মর্যাদা দেওয়া হয়: (ক) যদি সেই দল যে কোন চারটি অঙ্গরাজ্যে প্রদত্ত মোট বৈধ ভোটের ৬ শতাংশ সংগ্রহ করে এবং (খ) তা ছাড়া দলটি যদি কোন বা কয়েকটি রাজ্য থেকে লোকসভায় ৪টি আসন দখল করে; অথবা (ক) দলটি যদি লোকসভায় ২ শতাংশ আসন দখল করে এবং (খ) এই সদস্যরা তিনটি পৃথক রাজ্য থেকে নির্বাচিত হন।

কোন রাজনীতিক দলকে নিম্নোক্ত রাজ্য দলের মর্যাদা দেওয়া হয়: (ক) যদি সেই দল রাজ্যে প্রদত্ত মোট বৈধ ভোটের ৬ শতাংশ অর্জন করে, এবং (খ) তা ছাড়া দলটি বিধানসভায় দুটি আসন দখল করে; অথবা

দলটি যদি বিধানসভায় মোট আসনের ৩ শতাংশ দখল করে বা বিধানসভার তিনটি আসন দখল করে (যেটি বেশি হবে)।

(১৩) সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে রাজনৈতিক দল, নির্বাচন প্রার্থী, সরকার ও সরকারী কর্মচারী এবং ভোটদাতাদের জন্য প্রয়োজনীয় আচরণবিধি (Code of Conduct) নির্বাচন কমিশন নির্ধারণ করে।

(১৪) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মাবলী মানা হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য কমিশন পরিদর্শক নিয়োগ করে। এই সমস্ত পরিদর্শকের প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন নির্বাচন সম্পর্কিত বিভিন্ন অভিযোগ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

এই প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতির একটি অর্ডিন্যান্স সম্পর্কে উল্লেখ করা দরকার। এটি ১৯৮৫ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর জারি করা হয়। এর দ্বারা ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৫২ ধারার পরিবর্তন করা হয়। বলা হয় যে, কোন নির্দল প্রার্থীর মৃত্যুর জন্য কোন নির্বাচন কেন্দ্রে নির্বাচন স্থগিত থাকবে না। কেবল স্বীকৃত কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীর মৃত্যু ঘটলে নির্বাচন স্থগিত থাকবে। এই অর্ডিন্যান্সে রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থীদের জন্য অধিকতর নিরাপত্তার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। তবে এই অর্ডিন্যান্সটি ব্যাপক বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে।